‘ঝর্নাজলে সেই গ্রামোফোন…’

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

‘যমুনা ব্রিজের ’পরে গোধূলির সূর্য ডুবে যায়—

এখনি রাতের ট্রেন চলে গেল। দূরে কিনারায়
তিসক্ষেত, বালুচর, শৈলচূড়া সবই
যেন এই নদীকূলে উৎসারিত আকুল পৃথ্বী।

এই নদী অশ্রুনদী তবে ?

শূন্যে আকাশ জুড়ে অন্তিম আলোর কাছে পতঙ্গের রবে
বিদেশী নৌকা যায়— যেন কোন্ দিগন্তে যমুনা
শেষ হল— যেখানে স্বপ্নের দেশে স্রোত বিনা, জল বিনা
অগণ্য নৌকা ভাসে। বিস্মৃতির ঘাটে ঘাটে ততদূর

খেয়া-পারাপার করো চিরকাল তুমি পূরবীর সুর।’

'চৈত্রে রচিত কবিতা'র অন্তর্ভুক্ত এই কবিতার সান্নিধ্যে পাঠক অক্লেশে বুঝে নিতে পারেন, উৎপলকুমার বসু তাঁর তাঁতকলে অশ্রুউজ্জ্বল যে-সুতোটি এনে বসিয়েছেন তার আরেক প্রান্ত যেন পূরবীতে বাঁধা রবীন্দ্রনাথের 'অশ্রুনদীর সুদূর পারে…' গানে। তেমনি হয়তো আমাদের মনে পড়ে যায় 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থখানিকে এবং সেইসূত্রে 'বিজয়া'কে। 'যমুনা' শব্দটির সঙ্গে প্রেমের সুপ্রাচীন যোগাযোগের সূত্রেই হয়তো এমন প্রশ্নও জাগে— বিরহীর যমুনা নদীর অপরনাম কি তবে অশ্রুনদী? কিন্তু উদ্ধৃত কবিতাটিতে যখন আশ্চর্য এক দেশের উল্লেখ করেন উৎপলকুমার— যেখানে স্রোত বিনা, জল বিনা অগণ্য নৌকা ভাসে, তখন এক নতুন কবির অন্যতর কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পাই। আমাদের কবিতা-পাঠের অভিজ্ঞতায় স্রোত বিনা জল বিনা অগণ্য নৌকো ভাসার চিত্রকল্প কি সেভাবে পাওয়া যায়? যদি মনে পড়ে যায় 'সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় বিদেশী নায়ে', তাহলে না হয় এই কবিতার 'বিদেশী নৌকা'র অনুষঙ্গ অন্যতর মাত্রা পায়। কিন্তু ওই স্বপ্নের দেশ? হয়তো এখানে 'বিস্মৃতির ঘাট'ই আমাদের কাছে সেই স্বপ্নের দেশের চিহ্নার্পিত অনুষঙ্গে, পূরবীর সুরের সচলতায় কিছুটা এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা ভালো, কবিতাটি উৎপলকুমারের কথা অনুযায়ী আনুমানিক ১৯৫৩ সালে লেখা। তখন ফার্স্ট ইয়ার সায়েন্সের ছাত্র তিনি।

নানা কারণেই কবিতাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। অন্তত কবি উৎপলকুমারকে তাঁর নিজস্ব প্রবণতায় অনুধাবনের পক্ষে। একই সঙ্গে পরম্পরাকে স্বীকার এবং তাকে অতিক্রম করার প্রচেষ্টায় এই কবিতা তাই ভিন্ন মাত্রা পেয়ে যায়। এর কাঠামোয় একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনা কিছুটা দেখতে পাই, তেমনি অন্যদিকে পরম্পরা আত্মীকরণের প্রশ্নে তাঁর ব্যক্তিগত আবেশের অন্যতম ক্ষেত্র যে বাংলা গান, তাও প্রত্যক্ষ করার সুযোগ মেলে। বহিরঙ্গে এই কবিতা বাক্যপদকে মান্য করে যেমন অক্ষর-বৃত্তীয় ছন্দে, অন্ত্যমিলযোগে অসম মাত্রায় চরণবিন্যাসে নির্ভেজালভাবে বাংলা কবিতার একদা দুয়ার খোলা রাবীন্দ্রিক দিকনির্দেশকেও স্মরণ করায়। কিন্তু অন্তরে এই কবিতা যেন অধমর্ণ হয় রবীন্দ্রনাথের গানের কাছেই, এই বিপরীতমুখী টানকে খেয়াল না করলে হয়তো উৎপলের নিজস্ব উপার্জনকেও আমরা সঠিকভাবে চিনে উঠতে পারব না। আর এই সূত্রেই আমাদের জেনে নিতে হয় কীভাবে তাঁর পরম্পরা-বোধে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়ে এসেছে বাংলা গান। যদিও তিনি 'আধুনিক বাংলা গান'কে এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন এবং 'রবীন্দ্রনাথের পরে, অবশ্যই' এমন কথাও জানিয়েছেন। 'পূরবী সিরিজ'-এর সমসাময়িক পর্যায়ে লিখিত তাঁর আপ্তবাক্য সম্বল করেই আমরা এ ব্যাপারে আরো কিছুদূর অগ্রসর হতে পারি।

দুই

পরম্পরাকে আত্মীকরণের প্রশ্নে তিনি যে নিঃসঙ্কোচ এবং পৃথিবীর সমস্ত লেখায়,

যাবতীয় শিল্পে অকাতর উত্তরাধিকারের সূত্রেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র, আবিষ্কারের জগতও যে নিহিত, এমন কথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। 'স্মৃতি : ৩' কবিতাটি শুরু হচ্ছে— 'শুকনো পাতা ঝরে যায় কবে / সুরু (সুধীরলাল) বাংলায় /…' আমরা টের পাই, তার অনুষঙ্গে প্রায় বছর চল্লিশ আগে গীত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সেই গান—

'শুকনো শাখার পাতা ঝরে যায়—
তবু ফোটে ফুল, হায় একি ভুল,
পাখি তবু গান গায়…'

('লিরিক : হীরেন বসু ; সুর : অনুপম ঘটক)

সুধীরলাল-শচীনদেব-হেমন্ত— এই তিনজনকে 'স্মৃতি : ৩' কবিতায় উৎপল স্মরণ করেছেন। পাছে আমরা বিচ্যুত হই সেই ভয়ে যেন সামান্য সংকেতও লিপিবদ্ধ করে রাখেন '…বাংলায় আধুনিক গান / (রবীন্দ্রনাথে পরে, অবশ্যই)…'

হয়তো, শুকনো পাতা ঝরে যাওয়ার অনুষঙ্গে এমনও মনে হতে পারে— 'স্মৃতি : ৩' যেন রিলকের 'হেমন্ত' কবিতাটির সূত্রে কোথাও যুক্ত হয়ে আছে। রিলকের কবিতায় আছে—

'পাতা ঝরে, পাতা ঝরে, শূন্য থেকে ঝ'রে প'ড়ে যায়,
যেন দূর আকাশে বিশীর্ণ হ'লো অনেক বাগান ;
এমন ভঙ্গিতে ঝরে, প্রত্যাখ্যানে যেন প্রতিশ্রুত।…'

(অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু)

কিন্তু 'স্মৃতি : ৩'-এ পরবর্তী পংক্তিগুলি আরো একটি দিক নির্দেশ করে।

'…বিলেতে অনেক আগে কাতর
সন্তাপময় কবিতায় লেখা হ'ত
হেমন্তের ফেলে-দেওয়া পাতা ডাল
উড়ে চলে সন্ত্রাসভীত যেন
উন্মাদিনী লাল…'

এই সূত্রেই কি মনে পড়ে না শেলীর Ode to the West Wind-এর কথাও ? যেখানে শেলী বলছেন—

'O wild West Wind, thou breath of Autumn's being
Thou from whose unseen presence the leaves dead
Are driven....

Yellow, and black, and pale, and hectic red,
Pestilence-sticken multitudes : '

আর এইসব প্রভাব, অনুষঙ্গ ও অধীত বিদ্যার ঝরা পাতা ঠেলে, এক আলো-আঁধারি,

চেতন-অবচেতনে যেন মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে কবি নিজের অসংবদ্ধ স্বগতোক্তি আরম্ভ করেন প্রায় হ্যামলেটীয় ভঙ্গিতে—

'…ত্রিপুরায় আমরা (দেব
বর্মন পরিবার) তখন কত ছেলেমানুষ
সে-বছর বাড়ির সকলে
পুরীতে বেড়াতে গেল (ঝড়
হয়েছিল বহুদূরে আমরা যেন-বা
ভুলে ভেবেছিলাম বাড়িরই
অনতিদূরে ঝড় হয়েছিল)…' (স্মৃতি : ৩)

এইখানে আমরা হয়তো একই সঙ্গে দূরত্ব, দূরত্বজনিত কিছু ভ্রান্তি, বাল্যস্মৃতি এবং কিছুটা মধ্যবিত্ত বাঙালিয়ানারও দেখা পেয়ে যাই। স্মৃতিখননে উৎপলকুমার কিছু আক্রমণাত্মকও হয়ে ওঠেন বুঝিবা, এই কবিতারই আরেক পর্যায়ে। গঞ্জের শৈশব আর টাউনের কৈশোরে তাঁর স্মৃতি এরকম—

'…সেবার সিনেমা
ছিল ভ্রাম্যমাণ (বড়ুয়া ও আমাদের
পারিবারিক নিষেধের মধ্যে ছিল
বখে-যাওয়া চণ্ডল রায় ও তাঁর
ছায়ালোক প্রচারকৌশল) অবশ্য
আরো অনেক দেখেছিলাম সার্কাসের
ভাঁড়েদের অন্তর্ঘাতী তেজ ও কারুণ্য
(বিষে দুটি জানোয়ার মারা গিয়েছিল)…'

কিন্তু আমরা শেষ অব্দি ফিরে আসি আবার সেই চিরন্তন সংগীতের জগতে। যেন অস্ফুট স্বরে কবি বলেন—

'…আমাদের ছিল গ্রামোফোন
ও ফেলে-দেওয়া পিন, আমরা অনেক দূরে
হেমন্তের পাতার উপর ওগুলিই
ঢেলেছিলাম…'

কিন্তু নিষ্পত্র এই জগতও স্থির, অন্তিম কথা নয়। সংগীত-সিনেমা-কবিতার পরিমণ্ডল থেকে কবিকে অনুসরণ করে আমরা যেন পৌঁছই রাত্রি নেমে আসা এক গ্রামের বাড়িতে—

'সন্ধ্যায় অজস্র উই উড়ে আসত বন থেকে, আমরা
অন্ধকারে বসে রইতাম (সীতা
যেত কল ঘরে)…'

শব্দার্থবিদ্যার প্রয়োগ করে এখানে হয়তো আবিষ্কার করা যেতে পারে এক সাংকেতিক ভাষ্যও—

উই → বল্মীক → বাল্মীকি → সীতা

কিন্তু কবিতাটি শেষ হয় এক অতি ব্যক্তিগত, কিছুটা আত্মমগ্ন স্বীকারোক্তিতে—

'…সেদিন ছিলাম
বাল্যে, বিষণ্ণতা, তোমারই সন্তান, তোমাকেই
মাতৃজঠর বলে মনে হয়েছিল।'

তাহলে, পাঠকের বিচারে কবিতাটির বিবর্তন কীরকম দাঁড়াচ্ছে? এই প্রশ্নের নিরিখেই আমরা দেখি কবিতাটির বিবর্তন হয়তো এই প্রকার—

সূত্রপাত → পরিচিত জগৎ → অর্ধপরিচিত জগৎ → অপরিচিত জগৎ (কবির ব্যক্তিগত) → ঐতিহ্য/মিথ → আত্মোপলব্ধি। আর এই যাত্রাপথে বাংলা গানের দীপ্তি (যাকে উৎপল 'রবীন্দ্রনাথের পরে, অবশ্যই' লিখেছেন) প্রয়োজনীয় আলোকসম্পাতে তাঁর পথরেখা চিহ্নিত করেছে নিশ্চয়।

তিন

শুকনো পাতা ঝরা, কী বিলেতে কাতর সন্তাপময় কবিতা লেখার সূত্র ধরে, রবীন্দ্রনাথ হয়ে, গ্রামোফোন, সিনেমা ইত্যাদির অনুষঙ্গে বাংলা গানের ফেলে আসা এক পর্যায়ের উল্লেখে সুধীরলাল চক্রবর্তী, শচীন দেববর্মন কি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে যে বেদনাময় রোমান্সের স্মৃতিকে আধুনিক বাংলা গানের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত টানে ব্যক্ত করেন, তার থেকেই আমাদের পক্ষে বুঝে নেওয়া সম্ভবপর হয়— বাংলা কবিতায় রোমান্টিক বিষণ্ণতার সূত্রেই আধুনিক বাংলা গানের কথায়ও যে মেলানকলি-র ছোঁয়া লেগেছিল তা এতটাই সঙ্গ-নাছোড়, স্বয়ং উৎপলকুমার সেই মৃত্তিকার বন্ধনে থেকেই উপার্জন করে নেন নিজের প্রয়োজনীয় রসদটুকু। সেই বিষণ্ণতা— বাল্যে যাকে 'মাতৃজঠর বলে মনে হয়েছিল' তার থেকেও নিষ্ক্রান্ত হয় কবিতা। এইখানেই আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে ওঠে তাঁর আরো কিছু আপ্তবাক্য—

'ছিল একদিন, একদা যখন ছিল 'গীতিকবিতা' এই শব্দের অগোচরে আমরা জেনেছিলাম লিরিক তুমি সরল বীণার কাঠ, তুমি দুদিনের আয়ু বৈ নও, জানতাম ঐ 'রোমান্টিসিজম' শব্দের অন্তরালে দীর্ঘশ্বাস, হায় তা-ও নিলে অবশেষে, ছিল জিপসির যৌতুকপ্রিয়তা, ছিল কৌতূহল অবশ্যই, নইলে এলাম কিভাবে এতদূরে'

(শীত ; ১)

হয়তো আমাদের পক্ষে একথাও মনে রাখা ভালো, বাংলায় আধুনিক গান বলতে যেমন তিনি প্রথম বন্ধনীর ভেতর জানিয়ে দেন 'রবীন্দ্রনাথের পরে, অবশ্যই', প্রকৃতপক্ষে তা

গ্রামোফোন এবং আরো পরে আসা সবাক চলচ্চিত্রের সূত্রে শ্রম-বিভক্ত আধুনিক বাংলা গানের জগৎ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সূচনা হয়েছিল যে নাগরিক বাংলা গানের, যার সঙ্গে বাংলা নাটকের গানের সম্পর্কও কিছু দূরের ছিল না তখন, সেই গানই স্রষ্টার অখণ্ড সৃজনে প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বাংলা গান হয়ে উঠতে পারল রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্ত এবং নজরুলের অভিভাবকতায়। গ্রামোফোন প্রযুক্তি এদেশে আসার পর স্বয়ং নজরুলেরই যোগাযোগে বাজারিকরণের চাহিদাসূত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হয়। সবাক চলচ্চিত্রের যুগে যা আরো ব্যাপক প্রভাববিস্তারে সক্ষম হয়। আর রেডিও বা আকাশবাণীর ভূমিকা তো এ ব্যাপারে অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। যে রেডিও সম্পর্কে 'পুরী সিরিজ'-এর 'ভূমিকা'য় উৎপল-কুমার লেখেন— '...তানপ্রধান রেডিও আমার শুনেছিলাম চিতচোর মনচোর জলে যেতে সই পারব না লো...'। গ্রামোফোন-রেডিও-সবাক চলচ্চিত্রের সূত্রে গড়ে-ওঠা আধুনিক বাংলা গানের শ্রম-বিভক্ত দ্বিতীয় পর্যায়ই স্মৃতি : ৩-এ 'শুকনো পাতা ঝরে যায়'-এর সংলগ্ন হয়ে যায়।

যদি আমরা খেয়াল রাখি, বাংলা কবিতার গত হাজার বছরের ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে বাংলা গানের ইতিহাসই রয়ে গেছে ব্যাপকভাবে, তাহলে, কেন তিনি আধুনিক বাংলা গানকে তাঁর পরম্পরা-বোধের প্রশ্নে গুরুত্ব দেন, তাও হয়তো আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হবে ভিন্নতর মাত্রায়। ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্যের প্রশ্নে শুধু কবিতা নয়, বরং বাংলা গানই যে তাঁর নিজস্ব তত্ত্ববস্তু সংগ্রহে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে কিছু বেশি, একথা বললে হয়তো খুব ভুল হবে না।

চার

ক্রমশ আমরা এও দেখতে পাব, বাংলা গান তথা সামগ্রিকভাবে সংগীত, সুর, ধ্বনি, ও মূর্ছনার প্রয়োগে তিনি আরো নিপুণ এবং কিছু জটিলও হয়ে উঠেছেন। যার কেন্দ্রে শ্রুতি-কল্পনার উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। চিত্রকল্পও তখন আর একমাত্রিক কোনো ব্যাপার থাকে না। যেন চোখের বদলে কান : দৃষ্টির বদলে শ্রবণ : যেন উড়ন্ত আঁচলের বদলে পদধ্বনিকে অধিকতর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলতে চাইছেন। হয়তো বিমূর্ততায় পৌঁছনোর চেষ্টায় এও এক পাকদণ্ডী। এই পথ যে কিছু কঠিনতর, বলাই বাহুল্য। নিজের শ্রম আর আত্মবিশ্বাস-কে হয়তো নিজেই কিছুটা সন্দেহ করছেন, কিংবা কখনো উপহাসও করতে চান কিছুটা। এবার দেখা যাক তাঁর কবিতায় ছড়ানো দৃষ্টান্তসমূহ—

১) '...ছিল তানপ্রধান রেডিও আমার শুনেছিলাম / চিতচোর মনচোর জলে যেতে সই পারব না লো...' (ভূমিকা : পুরী সিরিজ)

২) 'বাঁশি তুমি ভেঙে ফ্যালো, সে আমাকে বলে না কিছুই।' (পুরী সিরিজ : ২)

৩) '...ঐ বাড়িটির গৃহকর্ত্রীদের হারমোনিয়াম বলে যন্ত্রখানি অযৌক্তিক মনে হয়েছিল
ঐ বাড়িটির যৌক্তিকতা আছে ?... (স্মৃতি : ২)

৪) '...ভিখারীর দলে মিশে আমি কি শুনি নি
জলের গভীরে রুদ্ধ শৃঙ্খলের ধ্বনি ?' (আরো প্রকৃতির ছবি)

৫) '...হায়, ঝর্নাজলে সেই
গ্রামোফোন বেজে ওঠে— ঘোরে নিচু সেলাইমেশিন,
স্বপ্নে তুমি কতবার তিরস্কার করেছিলে
ভাবি সায়াদিন—' (সেলাইমেশিন)

৬) 'কেবল পাতার শব্দে আমি কাল জেগেছি সন্ত্রাসে'
(আবার পূর্বী সিরিজ-এর উৎসর্গ-পত্রের কবিতা)

৭) '...যা তোমার হাত থেকে খসে পড়ে তাই আমি সাগ্রহে ধরেছি শব্দময় মূর্ছায়,
পতনে ও আত্মআবিষ্কারে পেতে আছি কান...'
(শোভাযাত্রা : ৩)

৮) '...এবারের সমুদ্রবাতাসে আমি খুলি নি জানালা শুধু আয়নায় ওঠে প্রতিধ্বনি
শুধু আয়নায় ওঠে প্রতিধ্বনি...'
(প্রতিহিংসাপরায়ণ পর্দা নিয়ে তুমি খেলা করো)

৯) '...লিরিক তুমি সরল বীণার কাঠ, তুমি দুদিনের আয়ু বৈ নও...' (শীত : ১)

১০) '...স্বপ্নের ভিতরে আমি শুনেছিলাম পারিবারিক বিবাহসম্বন্ধ, জানাশোনার
ভিতরে হ'লেই ভালো হ'ত...' (শীত : ১)

১১) '...এই গান গ্যারেজঘরের
ফেলেরাখা কাজ, নীল
ইস্পাতখণ্ড থেকে লাফ-দিয়ে-ওঠা
ধাতুকবিতার (খলসামগ্রী)
শেষতম হাড়'

১২) 'সমস্ত পাহাড় আজ চুপ
সব ঝর্না স্থির হয়ে আছে
প্রতিধ্বনি—গেলাস ভাঙছে
জঙ্গলে উড়ছে বোতল।' (আঁধার নামে : ২)

১৩) '...স্নানের একটু আগে
বাগান খেচরস্তব্ধ। কিছুকাল এমনই ঘটছে...' (অতিথি)

এইভাবে হয়তো উৎপলকুমারের কবিতায় যে এক বিচিত্র শব্দজগতের উল্লেখ ঘটেছে, তা দেখা যাবে। যেখানে কখনো সুর, কখনো কথ্যভাষা, কখনো যেন প্রলাপ, কিংবা কখনো হয়তো কোনো গীতিনাট্য, কী আরো বিস্তৃত সব ধ্বনি ও সুরের উপাদান

রয়েছে বলেই মনে হয়। এই সূত্রেই 'সেবাস্টিয়ান বাখ' (চৈত্রে রচিত কবিতা : ১৬ / শ্রেষ্ঠ কবিতা), 'সই লুডোখেলা', 'রামায়ণ গান' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠে।

পাঁচ

কিন্তু এক্ষেত্রে এমন প্রশ্নও উত্থাপিত হয়— কাকে তিনি প্রাধান্য দেবেন ?— কথাকে, না সুরকে ; চিত্রকল্পকে, না শ্রুতিকল্পকে ; ধ্বনিমূর্ছনাকে, না কঠোর গদ্যকে ; তা নিয়ে কিছু সংশয়-আকুলও হয়তো তিনি। মনস্ক পাঠক এই পত্রিকায় তাঁর মুদ্রিত কবিতাগুলির মধ্যেও কি এ কথার প্রমাণ পাবেন না কোথাও ? পাঠকের বিবেচনার ওপর সেই ভার অর্পণ করে এটুকু অন্তত পরিশেষে বলা যায়— লোকসমাজের পরিমণ্ডলে গড়ে-ওঠা গানকে জীবন-যাপনের দ্বান্দ্বিক অবস্থানে উৎপলকুমার এই সাম্প্রতিকেও চিহ্নিত করেছেন। শহরজীবন আর গ্রামজীবনের পার্থক্যের মাত্রায় গানের ভূমিকাও তখন হয়ে উঠেছে বস্তুমূলক দ্বন্দ্বেরই প্রকাশ। যখন তিনি লেখেন—

> 'শহরে শিখেছি যথার্থ গান, প্রতিটি সুরের রুদ্ধ বিধুর
> শোকার্ত ঘর চিনেছি শহরে, গলি ও বাজার, কষিত আঙুর,
> যামিনীচারিতা ; গ্রাম থেকে আমি কী-ই বা এনেছি, কথায় প্রচুর
> পিছুটান ছাড়া এবং এনেছি স্মৃতিবিভ্রম ভাষাবিদ্ধুর এতগুলি ভুল।'

আমাদের তখন পুনর্বিবেচনা করার অবকাশ ঘটে স্মৃতি : ৩-এরই সূত্রে তাঁর একথার অন্য কোনো তাৎপর্যও রয়ে গেল কিনা। কেননা 'হেমন্তের ফেলে-দেওয়া পাতা ডাল / পায়ে পিষে আমরাও গিয়েছিলাম / সিনেমা-হলের দিকে' পংক্তির সূত্র ধরেই 'হেমন্তের পাতার উপর' গ্রামোফোনের পিন ফেলে-দেওয়ার অনুষঙ্গে বোধহয় নিজেরই সঞ্চিত স্মৃতির মায়াময় পরিবেশ থেকে একসময় নিজেকে মুক্ত করে আনার প্রচেষ্টা কীভাবে গঞ্জের শৈশব, টাউনের কৈশোর আর বড় শহরের গলি ও বাজারে, যামিনীচারিতায় ভিন্নতর মাত্রা পেয়ে যায়— কীভাবে হয়ে ওঠেন কবি উৎপলকুমার বসু, তাও আমাদের কবির আপ্তবাক্যের নিরিখেই বুঝে নিতে হয়। সুরের ভুবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর কবিতার শরীরে শেষ অব্দি যা সঞ্চার করেন— বিচিত্র শ্রুতিকল্পের উপাদানে, তাও তো অন্যতর এক সুর, তাঁরই নিজস্ব— সেখানেই পাঠক কান পেতে রাখেন, বুঝে নেন সেই সুরের সামগ্রিক বয়ন। □